বিপ্লবী-বীর বাঘা যতীন

নীলোৎকুমার রায় চৌধুরী

বিপ্লবী-বীর
বাঘা যতীন

ডাঃ নীলোৎকুমার রায় চৌধুরী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[স্থাপিত ১৯৪০]
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড :: কলিকাতা-৭

প্রকাশন : কে. বসু,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

মূল্য : সাত টাকা

মুদ্রণ : শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

মৃত্যুহীন প্রাণ
তোমাকে প্রণাম !
যে অমৃতধামে
তোমার প্রয়াণ
সারা বুক ভরি
শুধু তারেই স্মরি !

হে মুক্তিযুদ্ধের চারণ! তোমার উদাত্ত কণ্ঠ পশেছিল দুর্বল জাতির হৃদয়ের পরতে পরতে। উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, উৎপ্রাণিত করেছিল দিকে দিকে তোমার লীলা-সহচরদের। সে যজ্ঞে তুমি নিজে ছিলে হোতা, নিজেই সমিধ। তোমার এই গৌরব-দীপ্ত আত্মদানে দেশ শোক ও ক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হয়েছিল।

হে মুক্তিমালার সুমেরু! অসত্যের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যা অস্তিত্বের বিরুদ্ধে—নিরলস সংগ্রামের অঙ্গীকার তোমারই প্রথম অবদান।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে আহবের যে ঐশী অভিযান—স্বয়ং তুমিই তার পরিচালক। আজ আমরা সকৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণতি জানাই তোমাকে। তোমার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করার উদ্যম, উৎসাহ, প্রয়াস ও প্রেরণা প্রার্থনা করি তোমারই কাছে।

আমরা তোমার অফুরান পথ-চলার ব্রত নিলাম !

নীলোৎকুমার রায় চৌধুরী

১৭১/৩ রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা-১৯

ভূমিকা

ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলোৎকুমার রায় চৌধুরী বাঘা যতীনের সম্বন্ধে চমৎকার তথ্যপূর্ণ নানা স্মৃতিকণায় ভরা এই জীবনীখানি লিখিয়াছেন। বাঘা যতীন বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের একজন প্রাতঃস্মরণীয় লোকনেতা। তাঁহার কৃতিত্ব কেবল লেখা-পড়া জানা ইতিহাস অনুশীলনকারী পণ্ডিত জনের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। তিনি একজন জনসাধারণের দ্বারা পূজিত বিপ্লবী। "বাঘা যতীন" এই নামের মধ্যেই তাঁহার জনপ্রিয়তা দেখা দিতেছে। তিনি মানসিক এবং চারিত্রিক বলে একজন শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন—শাশ্বত সত্তা বা ঐশ্বরিক শক্তিতে শেষপর্যন্ত তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল।

তিনি জাতি হিসাবে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না কিন্তু অত্যাচারী ভারত-শাসক হিসাবে তিনি ইংরেজের শত্রু ছিলেন। এবং প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া সেই শত্রুর হাত হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁহার হৃদয় ও মন একদিকে ছিল কুসুমকোমল এবং অন্যদিকে ছিল বজ্রের মত কঠোর। সেই বজ্রকঠোর মনের মধ্যে যে বজ্রকঠোর সঙ্কল্প নিহিত ছিল, তাহাকে কার্যকর করিবার জন্য তিনি দেহকেও শক্তিতে বজ্রকঠিন করিবার সার্থক সাধন করিয়াছিলেন। এই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। এবং নিজের হাতে একখানি ছোট ভুজালি দিয়া ২০ বৎসর বয়সে একটি হিংস্র সুন্দরবনের বাঘকে বধ করেন। তখন তাঁহার বয়সের বেশীর ভাগ বাঙ্গালী ছেলের মত তাঁহার বিবাহও হইয়াছিল এবং বাংলাদেশের বৃটিশ সরকারের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীও করিতেন। এই বীরত্ব দেখানোর পরে

বাংলাদেশে তাঁহার জনপ্রিয় নাম হইয়া দাঁড়ায় "বাঘা যতীন"—যে নামটির দ্বারা লোকের মধ্যে তাঁহার প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ পাইয়াছিল।

বাঘা যতীন রাজনীতি ক্ষেত্রে খোলাখুলি ভাবে তখন নামেন নাই, যদিও তাঁহার মনের ভিতরে স্বদেশপ্রীতির আগুন সদা জ্বলিত। তিনি এ বিষয়ে প্রথম আকৃষ্ট হইলেন শ্রীঅরবিন্দের আকর্ষণে এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া। শ্রীঅরবিন্দ তখন গায়কোয়াড়ের অধীনে কাজ করিতেন এবং তিনি তখন মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক তাঁহার একমাত্র ভগিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষের সহিত বাস করিতেন। তখনকার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে (এখনকার বিধান সরণীতে) অক্সফোর্ড মিশনের পিছনের গলিতে তাঁহারা যে বাড়ীতে থাকিতেন সেখানে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত কতকগুলি বাঙ্গালী যুবকও আসিয়া মিলিতেন। এইখানেই যতীন্দ্রনাথ স্বদেশ-উদ্ধার-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে তিনি শ্রীঅরবিন্দের দ্বারা অনুশীলন ও যুগান্তর সম্প্রদায় এবং যুগান্তর পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হন। শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত অন্যান্য নানা স্বদেশপ্রেমমূলক অনুষ্ঠানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। কলিকাতায় বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা ছিলেন টেগার্ট সাহেব এবং তাঁহার সহিত মিলিয়া বিচারক কিংসফোর্ড সাহেব, বাঙ্গালী রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত যুবকদের নিষ্ঠুর দণ্ডদান করিতেন। এই কিংসফোর্ড সাহেবকে বোমা দিয়া মৃত্যুদণ্ড দিবার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী নিজেদের প্রাণ দেন, কিংসফোর্ড বাঁচিয়া যান। প্রফুল্ল চাকী একদিনের জন্য পলাইয়া গিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়েন এবং অসাধারণ সাহস দেখাইয়া ১৬ বৎসরের এই বীর বালক হাসিমুখে ফাঁসি যান। এই ব্যাপার লইয়া কলিকাতায় পুলিশের ধরপাকড় চলে ; এবং মানিকতলার

বাগানে যুগান্তর দলের প্রায় সকলেই ধরা পড়ে। ইহা লইয়া কলিকাতায় বহুদিন ধরিয়া বিখ্যাত বোমার মামলা চলে ১৯০৫ সালে এবং অবশেষে শ্রীঅরবিন্দ ধরা পড়িবার পর মুক্তি পাইয়া বহুদিন চন্দননগরে থাকেন এবং সেখান হইতে ফরাসী অধিকারভুক্ত পণ্ডিচেরি নগরে পল ও মীরা রিশার নামে এক ফরাসী দম্পতীর কাছে আশ্রয় পান এবং এইখানেই তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন ও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেইখানেই তাঁহার দার্শনিক ও ভগবদ্‌বিষয়ক মতবাদ প্রচার করেন। শ্রীমতী মীরা রিশার এই আশ্রমের আশ্রমমাতার রূপে ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনে আত্মনিয়োজিতা হন।

বাঘা যতীন ইহার পর পুলিশের সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার হন এবং এক বৎসর বিনা বিচারে জেলে থাকেন ; পরে ছাড়া পান। জেলে যাইবার আগেই ইংরেজের চাকরী ছাড়িয়া দেন। এইবার তিনি পুরাপুরি স্বদেশের কাজে নামিলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলিতেছে এবং প্রবলপ্রতাপ জার্মানির আক্রমণে ইংরেজ নিতান্ত বিপন্ন। সেই অবসরে ভারতবর্ষের মুক্তিকামী তরুণেরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তজ্জন্য ইংরেজের শত্রু জার্মানির নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই কাজে তাঁহারা জার্মানির সহানুভূতি ও সহায়তা পাইলেন এবং যাঁহারা এই কাজে নামিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কলিকাতার অবনী মুখোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ("বাঘা যতীন")।

ইঁহারা ভিন্ন, অনেকে ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত—বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। চন্দননগরে ইঁহার বাস ছিল। বহু বৎসর কাল পরে জাপানের টোকিওতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ছিলেন এই ব্যাপারে একজন শ্রেষ্ঠ নেতা। ইঁহারা ঠিক করিয়াছিলেন যে আমেরিকা হইতে জার্মানীরা জাহাজ বোঝাই করিয়া অস্ত্রশস্ত্র

পাঠাইবে—পূর্ব ভারতে সমুদ্রতীরে নদী ও অরণ্যসঙ্কুল কতকগুলি দুর্গম অঞ্চলে তাহারা কেবল অস্ত্র পাঠাইবে, সৈন্য নহে। ভারতে ইংরেজ সৈন্য ছিল না, ভারতীয় সৈন্যরাও ইউরোপের রণক্ষেত্রসমূহে ইংলণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য, ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যদের পাশে দাঁড়াইয়া প্রাণপণ লড়িতেছে। ভারতকে বিদেশী আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য ইংরেজ সরকারের মোটেই সৈন্যবল নাই। এমত অবস্থায় চট্টগ্রাম, দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে এবং উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় বুড়ীবালামের অঞ্চলের কাছে সমুদ্রে আমেরিকা হইতে জাহাজে করিয়া যে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র আসিবে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য, এই বাঙ্গালী বিপ্লবী যুবকগণ তৈয়ার থাকিবে এবং সেইসব গ্রহণ করিয়া দেশের বিপ্লবী যুবকদের হাতে সেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।

কিন্তু বিধির বিধানে সমস্তই ওলটপালট হইয়া গেল কতকগুলি দেশদ্রোহীর শত্রুতায়—ইংরেজরা সমস্ত খবর পাইল এবং জার্মানরা এইসব গোপনে ভারতবর্ষে পাঠাইতে পারিল না। টেগার্ট সাহেব কলিকাতায় খবর পাইলেন, বালেশ্বর জেলায় বুড়ীবালামের জঙ্গলে কিছু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়া বাঘা যতীন ও তাঁহার সাথী আর-চারজন বীর যুবক—চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ—ইঁহারা গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, তখনই কলিকাতা হইতে কিছু ইংরেজ পুলিশ টেগার্ট সাহেবের যত্নে বাঘা যতীন ও এই চারজন বীর আত্মত্যাগী যুবকের বিরুদ্ধে পাঠানো হইল; প্রায় এক হাজার পুলিশ ও সৈন্যের সহিত ছয় ঘণ্টার ট্রেঞ্চ যুদ্ধে বহু হতাহতের পর চার বীর মৃত্যুবরণ করিল। ইঁহাদের এই বীরত্বপূর্ণ আত্মদানের কথা গ্রন্থকার তাঁহার এই বইখানিতে লিখিয়াছেন। এই ভাবে ভারতবর্ষে বীরত্বের এক মহাপুণ্যময় অবদান তিনি ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য ধরিয়া দিয়া গেলেন। এতদ্ভিন্ন বাঘা যতীন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সম্বন্ধে অনেক তথ্য এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে,

যাহা অন্যত্র পাওয়া যাইবে না। যেমন তাঁহার ভগিনী পূজনীয়া বিনোদবালা দেবী ও সাধ্বী পত্নী ইন্দুবালা দেবীর কথা এবং তাঁহাদের সন্তানদের কথা, এবং তদতিরিক্ত তাঁহাদের পরিবারের নানা সংবাদ ও তথ্য।

এই সকলের সংযোগে বইখানি একক এবং অতুলনীয়। বাঙ্গালী জাতির সাম্প্রতিক ইতিহাসের পক্ষে এই পুস্তক একখানি অত্যন্ত মূল্যবান দলিলরূপে আশা করি সকলের নিকট সম্মানিত হইবে। ইতি—১৭ই পৌষ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ; ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৫ নং হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

বিপ্লবী-বীর
বাঘা যতীন



যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(বাঘা যতীন)

আবির্ভাব

বাংলা ১২৮৬। ১১ই অগ্রহায়ণ, বুধবার। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া —আর তারই বুকে কয়া গ্রাম। এই গ্রামটিই ছিল আমাদের বাঘা যতীনের মাতুলালয়। একদিন পবিত্র উষাকালে এক পুণ্যলগ্নে এই মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করলেন আমাদের চির-পরিচিত 'বাঘা যতীন' বা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যতীন্দ্রনাথের পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম শরৎশশী দেবী। এঁরা বাস করতেন যশোহরের রিশখালি গ্রামে। পিতা উমেশচন্দ্র দীর্ঘায়ু ছিলেন না, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রতিপত্তির সঙ্গে তিনি বসবাস করে গেছেন। কয়েক বিঘা মাত্র জমির মালিক ছিলেন তিনি—কিন্তু চরিত্রবল ও পাণ্ডিত্যে শীর্ষস্থানীয় এই ব্যক্তিটি ছিলেন সকলের গর্ব ও গৌরবের স্থল। এঁরই সহধর্মিণী শরৎশশী দেবী ছিলেন অসামান্যা মহীয়সী। একদিকে যেমন গৃহকর্মে, অপরদিকে তেমনি শিল্পকৃতিতে ইনি ছিলেন সমান পারদর্শিনী। বিশেষ যে কারণে তিনি মহীয়সী অভিধায় বিশেষিত, তা হল তাঁর চরিত্রের সংবেদনশীলতা। কোথাও কারও বিপদ-আপদের কথা কানে এলেই তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না—ছুটে গিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় তাদের সহায়তা করাই ছিল তাঁর জীবনব্রত। সহৃদয়তার এই বিশিষ্ট গুণটি যতীন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন তাঁর মায়েরই চরিত্র থেকে। শরৎশশী দেবীর আরও একটি অনবদ্য গুণ ছিল—তাঁর কবিতা-রচনার সুকৃতি।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হন যতীন্দ্রনাথ। মা ও দিদির সঙ্গে চলে আসেন তাঁর মামাবাড়িতে। যতীন্দ্রের বড়মামা

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় নদীয়া জেলার নামকরা প্রতিষ্ঠিত পুরুষদের একজন। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি উপলক্ষ্যে আইনজীবী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিবারবর্গের সঙ্গে বসন্তকুমারের সৌহার্দ্য জন্মে। এদিকে শরৎশশীর উদার ও অসামান্য চরিত্রটি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে বসন্তকুমারকে—তাই তিনি ভাগ্নী বিনোদবালা ও ভাগ্নে যতীন্দ্রের দায়িত্ব শরৎশশীর হাতে ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হন। শুধু তাই নয়, কয়ার এই একান্নবর্তী চাটুজ্যে পরিবারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পণ করেন এঁরই হাতে।

শৈশবের শিক্ষা

সে সময় বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে মানুষ-গড়ার যে আদর্শ খুঁজে পান শ্রীযুক্তা শরৎশশী, তারই ভাস্বর আলোকে তিনি অনুপ্রাণিত করে তোলেন বিনোদবালা ও যতীন্দ্রকে।

কয়া গ্রামের অনতিদূরে গড়াই নদী। নদীটি পদ্মারই একটি শাখা। বিস্তৃত এর বিস্তার, প্রখর এর স্রোত। শরৎশশী কিশোর যতীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন স্নান করতে এই গড়াই নদীতে। প্রথম প্রথম সাঁতার দেওয়া ত' দূরের কথা, জলে ডুব দিতেও ভয় পেত যতীন। শরৎশশী যতীনের মাথাটাকে জোর করে জলে ডুবিয়ে ধরে রাখতেন কিছুক্ষণ, তারপর দিতেন ছেড়ে। এই প্রক্রিয়ার পর যতীনের ভয় গেল ভেঙে। তখন আর দেখে কে! ডুব দিতে দিতে ডুব-সাঁতার পর্যন্ত শেখা হয়ে গেল তার। কিছুদিনের মধ্যেই যতীন হয়ে উঠল প্রচণ্ড সাঁতারু। সাঁতরিয়ে পার হতে লাগল গড়াই নদী—জল হয়ে গেল জল-ভাত!

কুকুর দেখলে ভীষণ ভয় পেত যতীন। নজরে এলো শরৎশশীর। একদিন ঘাটে যাবার পথে দাঁড়িয়ে ছিল মস্ত একটা কেলো কুকুর। একটা ইতস্তত ভাব দেখা গেল যতীনের মধ্যে।

শরৎশশীর চোখ এড়াল না—বুঝলেন যতু ভয় পেয়েছে। মুখে বললেন না কিছু। সিংহ-শিশু কিনা ভয় পাবে সামান্য একটা কুকুরকে? মায়ের হুকুম, "যাও দেখি! তাড়িয়ে দিয়ে এসো ত' ঐ কুকুরটাকে?" আর ছাখে কে! এ যে মায়ের আদেশ। অমনি প্রদীপ্ত তেজে শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠল। এমন মারমুখী চেহারায় এগিয়ে গেল কুকুরের দিকে যে সারমেয় ত' ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দে-ছুট্ দে-ছুট্। এমনি করে একটির পর একটি ভয় ভাঙাতে লাগলেন শরৎশশী।

যে মায়ের রক্তে যতীনের অণুপরমাণু গঠিত সেই মায়ের নির্ভীকতা জীবনভর লক্ষ্যে অলক্ষ্যে কাজ করেছে যতীনের জীবনে। ধন্য সেই বীরাঙ্গনা মাতা আর ধন্য তাঁর এই বীর সন্তান।

কৈশোরে পা দিল যতি। কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলের ছাত্র সে। ১৮৯৩। এই সালটিতে স্বামী বিবেকানন্দ যাত্রা করেন চিকাগোতে, আর অরবিন্দ বিলেত থেকে ফিরে আসেন দেশে।

এইসময়কার একটি ঘটনা। কৃষ্ণনগর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল যতি। মুকুল বয়স কিন্তু কী তেজোদৃপ্ত! নিয়মিত ব্যায়ামে পরিপুষ্ট দেহ-পেশী, উজ্জ্বল দৃষ্টি, উন্নত বক্ষ।

হঠাৎ এক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড! রাজবাড়ির আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে দে-ছুট দে-ছুট। টগবগ টগবগ শব্দে ধুলোবালি উড়িয়ে বড় রাস্তা ধরে সে কী এলোপাথাড়ি ছুট! রাস্তার পাশের দোকানদাররা ঝপাঝপ ঝাঁপ দিল ফেলে আর সমস্বরে চেঁচাতে লাগল—"ওরে যতে, সরে আয়, সরে আয়—পাগলা ঘোড়া ছুটেছে!" এক মহা বিষম হুলুস্থূল কাণ্ড! যতি ত' হতভম্ব। কিন্তু পালাবে কি? তার চোখ পড়ল একটা বাচ্চা ছেলের উপর। কী সর্বনাশ! এখুনি যে ছুটন্ত ঘোড়া ওকে ছিন্নভিন্ন করে ছাড়বে। পলকে প্রলয় ঘটল বলে! অবসর কই চিন্তার? এক লাফে ছেলেটিকে আড়াল করে যতি এসে দাঁড়াল

রাস্তার ওপর। আর ঘোড়াটা যেই সামনে এগিয়ে এল অমনি এক লাফে যতীন্দ্রনাথ সেই পাগলা ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো—কিন্তু সাধ্য কি সোজা হয়ে বসার! অশ্বপুঙ্গব মহাক্রোধে গগনভেদী চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে শিষ-পা করে মানুষের মত সোজা হয়ে উঠল—কিন্তু পড়েছে যতির পাল্লায়! সেও কিছু কম যায় না। চক্ষের নিমেষে প্রচণ্ড তেজে যতি ওর গলায় চাপ দিয়ে পড়ল ঝুলে আর চেঁচিয়ে বলতে লাগল ঃ "দড়ি এনে এটাকে বেঁধে ফেল—বেঁধে ফেল!" ইতিমধ্যে বাচ্চা ছেলেটা সরে গিয়ে হল বিপন্মুক্ত।

এই ঘটনার পর কৃষ্ণনগর যুড়ে উচ্চারিত হতে লাগল যতির নাম। সরকারী উকীল বসন্তবাবুর ভাগ্নে শেখালে বটে সাহস বলে কাকে! এই ছেলেটা একদিন দেশকে কাঁপিয়ে ছাড়বে। কিশোর কৃষ্ণ যেমন কালিয়-দমন করেছিলেন, কিশোর যতি তেমনি এই দুর্মদ অশ্বকে শায়েস্তা করে ছাড়লো। ধন্য ধন্য রবে সোচ্চার হয়ে উঠলো সবাই।

কুষ্টিয়ায় যতির মামাবাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে জেলাবোর্ডের সোজা সড়ক সেই কুমারখালি পর্যন্ত। এই রাস্তা ধরে যতি ঘোড়ায় চেপে ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে না আছে জিন, না আছে লাগাম। বাঁ হাতে ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে আর ডান হাতটিকে চাবুকের মত ঘুরিয়ে ঘূর্ণিবায়ুর মত ছুটে চলাই ছিল এই বালক বেদুইনের প্রবল ব্যসন।

ভরা বর্ষায় গড়াই নদী তরঙ্গে উত্তাল। তিন-চার হাত উঁচু ঢেউ উঠছে আর পড়ছে—তারই সঙ্গে বুক-কাঁপানো বিকট গর্জন। যতি কিন্তু অকুতোভয়। স্নান করতে নেবে যতি কখনো ডুবে যায় ঢেউয়ের নীচে, কখনো ভেসে উঠে শুশুকের মত—নেই ভয় নেই ডর! কখনো বা সাঁতরে চলে যায় কয়া থেকে সাত মাইল দূরে কুমারখালি পর্যন্ত।

শুধু তাই নয়। ছোটবেলায় সে শুনেছে গ্রামের ডাক-হরকরা ভুঁইমালির কাছে বুনো শূকর ও সজারু শিকারের কাহিনী। এখন স্বয়ং সে এই সজারু-শিকারের নায়ক। কিশোর যতি পূর্ণিমার মাঝরাতে সড়কি হাতে ছুটে চলত ঝুমুর-ঝুমুর-শব্দ-তোলা সজারুর পিছনে। এই হল আমাদের কিশোর যতি। 'ভয় কারে কয় নেইক জানা'—এই যে অভীক মন্ত্র এমনি করেই তাতে শিক্ষা ঘটল যতিসম্রাট যতীন্দ্রনাথের। শিকারের অর্থ অব্যর্থ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, কষ্টসহিষ্ণুতায় দীক্ষা ও বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করার একাগ্রতা। নিষ্ঠুর পশুহত্যার বিলাস কিন্তু ছিল না যতির মধ্যে।

শুধু কি এই! গ্রামে ছিল কালীবাড়ি। সেখানে বিরাট কালীপ্রতিমা তৈরী করে সারারাতব্যাপী পূজা হত। পুরোহিত দু'হাতে দুইটি বড় ধুনুচি নিয়ে আরতি সুরু করতেন আর আমাদের যতি বাদকের কাছ থেকে বড় ঢাকটিকে তুলে নিত পিঠে আর তালে তালে সারা প্রাঙ্গণ ঘুরে তাই বাজিয়ে চলত। চতুর্দিক মুখরিত হত 'মা' 'মা' শব্দে। কখনো হাঁটু গেড়ে, কখনো লাফিয়ে প্রবল তেজে সে ঢাক বাজাত।

গ্রামের হরিসভার প্রতিষ্ঠাতাও আমাদের ওই যতি। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাতে কিশোর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ি বাড়ি প্রসাদ খেয়ে বেড়াত। গ্রামের ফুটবল ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের প্রতিষ্ঠাতাও যতীন্দ্রনাথ।

যৌবনারম্ভ

মুকুল এবার ধীরে ধীরে উন্মেষিত হতে শুরু করল। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে কি-একটা দূরাগত ধ্বনি যেন তাকে আপনভোলা করে তুলতে লাগল। কি-এক অপার্থিব সঙ্গীতের অনির্বচনীয় সুর—কোন অজানার এক অনির্দেশ্য

আহ্বান! সাগর-সঙ্গীতের মত তরঙ্গায়িত সেই সুর কখনো দুরন্ত, কখনো বা স্তিমিত।

যতীন্দ্রনাথের মাসতুত ভাই শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। তিনি তাঁর দিদিমার জবানিতে বলেছেন: "যৌবনারম্ভে যতি যেন কেমন হয়ে উঠল। তার চোখেমুখে কপালে কেমন একটা অপূর্ব আবেশের আবির মাখান থাকত। নতুন বৌ স্বামীর সোহাগ পেয়ে যেমন একটা অদম্য পুলক-চাঞ্চল্য ও গোপন শিহরন সর্বাঙ্গে অনুভব করে—চেষ্টা করেও তাকে সম্বরণ করতে পারে না—অপরের চক্ষুতে ধরা পড়ে যায়—যতির মধ্যেও সেই রকম একটা অবস্থা দেখতে পেতাম।"

যতির মধ্যে অমিতবীর্যের যে প্রকাশ ঘটে তাকে রুখবার সাধ্য কার? এই বীর্যেরই বহিঃপ্রকাশ দেখি বিভিন্ন ঘটনায়। একবার কুষ্টিয়া থেকে বাড়ি ফিরছে—উঠতে যাবে খেয়াপারের নৌকায়—এমন সময় এক ভিখিরী এসে আবেদন জানাল, "দাদাবাবুগো! আমাকে তোমার একটা পুরানো কাপড় দেবা? গেরো দিয়ে দিয়ে আমারটা যে আর পরাই যায় না।" যতি চেয়ে দেখল—শতচ্ছিন্ন তার জীর্ণ বসন। ছল্‌ছল্‌ করে উঠল চোখ দুটো। পকেটে হাত দিয়ে যা কিছু ছিল সব বার করে ওর হাতে উপুড় করে দিয়ে বললে, "এই নাও, একটা নতুন কাপড় কিনে নিও।" লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে রইল—তার হাতে একখানা দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো পয়সা!

আর একদিনের ঘটনা। খেয়া পার হয়ে বাড়ি ফিরছে যতীন্দ্রনাথ। সন্ধ্যা হয়-হয়। নৌকা থেকে নেমেই দ্যাখে এক মুসলমান বৃদ্ধা বিরাট এক বোঝা কাটা-ঘাস নিয়ে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাটা এত বড় যে, মাথায় তোলার ক্ষমতা নেই তার—আর যদিও বা ঠেলে-ঠুলে তোলা যায়, বইবার

সাধ্য কোথায়? বড়ই করুণ কণ্ঠে বুড়ী বলে উঠল, "সাহেব-বাবুগো, আমার বোঝাটা একটু তুলে দেবা!" দু'হাত দিয়ে বোঝাটা অনুভব করেই যতি বুঝে ফেলল, এত ভারী ঘাসের বোঝা বইবার ক্ষমতা বুড়ীর সাধ্যের বাইরে। যতি বললে, "চল বুড়ীমা—আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসছি।" এক ঝটকায় তুলে নিল সেই বিরাট ঘাসের বোঝাটি নিজের মাথায়। বুড়ীর গাইগুঁয়েতে কর্ণপাতের ধার ধারে কে? বুড়ী ত' বিড়বিড় করে সমানে খোদাতাল্লার দোয়ার কথা বলতে বলতে চলল যতির সঙ্গে আর মনে মনে তাকে কতই না আশীর্বাদ জানাল। স্বর্গ থেকে না জানি কোন দেবতা এসে তাকে এই দোয়া জানাল—খুনখুনে বুড়ীর কেবল ঐ এক দুশ্চিন্তা! বোঝাটা নাবিয়ে বুড়ীর হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিয়ে ফিরে এলো যতি। যতির সাহেবী পোশাকের যে কি দুর্গতি দাঁড়াল পাঠকবর্গ তা অনুমান করে নিন।

সদাব্রতের মূর্তিমন্ত প্রতীক আমাদের এই ক্ষুদে নায়কটি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা-সঙ্কুল জীবন আর কার? কোমলে-কঠোরে এক আশ্চর্য ধাতুতে গড়া যতির চরিত্র—মমতায় সমুদ্র, দার্ঢ্যে দিক্‌পাল, বীরত্বে বজ্র।

আবার মনে পড়ছে দিদিমার কথা: "যতি যে সাধারণ মানুষ নয়, এ সময়ে তা বুঝতে পারতাম। সে যেন বহুদূরে এক বাঁশির ডাক শুনতে পেত। মাঝে মাঝে কী এক অপূর্ব জ্যোতি ফুটে উঠত তার চোখেমুখে। কী এক আনন্দে যেন চমকে উঠত থেকে থেকে! বিজয়া-দশমীর পর যতি কোলাকুলি করত—জোলা, বিন্দী, ভুঁইমালী, কুরি, মুচি—কাকেও সে ছেড়ে দিত না নিবিড়তম আলিঙ্গন না করে। তার ক্রিয়াকাণ্ড দেখে আমরা হয়ে যেতাম হতবাক্!"

একদিন কোলকাতা থেকে কয়ার বাড়িতে ফিরছেন। বর্ষাকাল।

চাটগাঁ মেল এসে থামল কুষ্টিয়া স্টেশনে। চেয়ে দেখলেন গর্জমান গড়াই টইটম্বুর দেহে গুমরে গুমরে উঠছে। গড়াইয়ের ঘাটে পারাপারের কোন ব্যবস্থাই নেই। ছেড়ে দিল চাটগাঁ মেল—ছুটে চলল ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে। পরের স্টেশন সেই রাজবাড়ি গিয়ে গাড়ি থামবে ১৬ মাইল দূরে। ইতিমধ্যে ট্রেন ছুটতে থাকবে চড়াইখালি, কুমারখালি, খোকসা প্রভৃতি স্টেশন একটানা টপ্‌কে।

ট্রেনটি গড়াই নদীর পুল পেরুতেই যতীন্দ্রনাথ কামরার দরজা খুলে ফুটবোর্ডে এসে দাঁড়ালেন হাতল ধরে। ট্রেনটি যেই জেলাবোর্ডের রাস্তাটি পেরুতে সুরু করেছে অমনি যতি সেই চলন্ত ট্রেন থেকে সুট করে নেবে পড়লেন নীচে। এই অকুতোভয় মানুষটির এমনি ছিল মনোবল তথা দৈহিক ক্ষমতা। এক কথায়, অবিশ্বাস্য। সকলকে স্তম্ভিত করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি বাড়ি গিয়ে হাজির। মাত্র একবারই নয়। প্রয়োজনবোধে এমন কাণ্ড করেছিলেন বেশ কয়েকবার।

সেই দুর্দম দুর্দান্ত যৌবনের কূলপ্লাবী শক্তিকে তিনি মুক্ত করে দিয়েছিলেন সহস্র ধারায়। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য আর্ত-পীড়িতের সেবা। রাতের পর রাত জেগে তিনি রোগীর সেবা করেছেন ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন। বসন্ত, কলেরা, কুষ্ঠ কোন রোগই বাকি নেই—তাঁর কুণ্ঠাহীন সেবাপরায়ণতা ভাষায় বর্ণনাতীত। তিনি বুঝেছিলেন দেশ মানে শুধু গাছ পাথর পাহাড় পর্বত নয়—দেশের প্রাণকেন্দ্র এই দেশেরই মানুষগুলি। এদের জীবন থেকে যদি দুর্বলতার গ্লানিই না দূর করতে পারেন, তবে ধিক্ তাঁর মনুষ্যজীবন!

মধ্যাহ্ন-গগন

সমাজের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া চাই তাঁর। কারণ দেশের সেবা মানে ত' এদেরই সেবা। তাই যতীন্দ্রনাথ

বেছে নিলেন দশ-প্রহরণ-ধারিণী দশভুজা দেবী দুর্গাকে। কয়া গ্রামে বড় ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হত এই পূজা। আনন্দের জীবন্ত মূর্তি আমাদের যতিও উদ্বেল হয়ে উঠতেন এই পূজা উপলক্ষ্য করে। একদিকে মায়ের আরতির সময় যেমন সোৎসাহে ঢাক বাজাতেন, তেমনি বিসর্জনের সময় গ্রামের সব ছেলেমেয়ে নিয়ে বাচ-খেলায় মত্ত হয়ে উঠতেন। রাশি রাশি কদমা, বাতাসা, খাগড়াই বিলোতেন ছোটবড় সকলের হাতে হাতে। কী এক ভাবাবেশে তিনি বুঁদ হয়ে থাকতেন এই সময়টা। উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হত তাঁর মাতৃ-আহ্বান: শক্তি দে, মা!—শক্তি দে! সত্যি সত্যি তিনি ছিলেন শক্তিসাধক আর মা তাঁর সহস্রকরে এই শক্তি-শ্রেষ্ঠ সন্তানটিকে অজস্র আশীর্বাদে অভিষিক্ত করতেন।

বিদ্যার্জন পর্ব

কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যতীন্দ্রনাথ চলে আসেন মেজমামা ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। এখানে থেকে তিনি সেণ্ট্রাল কলেজে এফ.এ. পড়তে সুরু করেন এবং সেই অবসরে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখে ফেলেন। এফ.এ. পরীক্ষা আর দেওয়া হল না, তার আগেই আমলুটি কোম্পানীতে চাকুরি গ্রহণ করেন। এই চাকুরি-গ্রহণের পরেই যতীনের বিবাহ হয় ইন্দুবালা দেবীর সঙ্গে। ইন্দুবালা লালিতা হন তাঁর মাতুলালয় কুষ্টিয়া মহকুমার কুমারখালিতে।

এরই পর বাংলা সরকারের সেক্রেটারি হুইলার সাহেবের একজন স্টেনোগ্রাফার প্রয়োজন হওয়ায়, যতীন্দ্রনাথ ঐ পদটিতে বহাল হন আড়াইশ টাকা বেতনে। তখনকার দিনে এই সম্মানজনক চাকুরি-লাভ বড় সহজ ছিল না।

একবার হুইলার সাহেবের সঙ্গে দার্জিলিং চলেছেন যতীন্দ্রনাথ। শিলিগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। কামরার ভিতরে অসুস্থা

এক প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলা জল-তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়লেন। ভদ্রমহিলার স্বামী চেষ্টা করেও পানিপাঁড়েকে ধরতে পারলেন না। যতীন্দ্রনাথ তখন ভদ্রলোকের ঘটিটি হাতে ছুটে চললেন স্টেশনের কল থেকে জল আনতে—হুঁস নেই কোন দিকে। প্লাটফর্মে দাড়িয়ে জনাকয়েক গোরা সৈনিক সিগারেট টানছিল—হঠাৎ একজন গোরার গায়ে যতীন্দ্রনাথের ধাক্কা লেগে গেল, যতীন্দ্রনাথ একটু থেমে বললেন, 'I am so sorry.' কিন্তু কে কার কথা শোনে—ধরাকে-সরা-জ্ঞান-করা ঐ গোরাপুঙ্গব তার হাতের ছড়ি দিয়ে যতির পিঠে সপাং করে কষিয়ে দিল এক-ঘা। যতির হাতে জল আনার ঘটি, ফুরসুত নেই এক ফোঁটা। ঘটি-ভর্তি জল সেই ভদ্রলোকটির হাতে পৌঁছে দিয়েই তিনি বুক উঁচিয়ে গোরাপুঙ্গবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, 'Remember your God now'—বলেই মুখে তার এক মোক্ষম ঘুষি। ঘুষির চোটে গোরাপুঙ্গব প্রায় ধরাশায়ী। বাকি ওর সঙ্গীরা একসঙ্গে আক্রমণ করল যতিকে। কিন্তু তিনিও কি ছাড়বার পাত্র! যতির সে কি প্রলয়ঙ্কর মূর্তি। সমানে দু'হাতে দমাদ্দম ঘুষি চালাতে লাগলেন বেপরোয়া হয়ে ওদের বুকে থুতনিতে নাকে মুখে। যতি যে আহত হননি তা নয়, কিন্তু কি আসে-যায় তাতে। এই free fight-এ ঘুষির চোটে তিনি গোরাদের ধরাশায়ী করে ছাড়লেন।

সাহেব স্টেশনমাস্টার পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করাতে চাইলেন, কিন্তু সুবিধে হল না। যতি তাঁর কার্ড দেখিয়ে বললেন যে, তিনি চলেছেন সেক্রেটারি হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার হিসাবে সরকারী কাজে দার্জিলিঙে—তাঁকে শিলিগুড়িতে আটকান চলবে না।

স্টেশনমাস্টার অবস্থা বুঝে যতিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। ঐ ট্রেনেই তিনি পৌঁছে গেলেন দার্জিলিঙে।

এদিকে মিলিটারি সাহেবদের কর্তা চাইল যতির বিরুদ্ধে

মামলা দায়ের করতে। হুইলার সাহেব ঘটনার কথা শুনে গোরাদের কম্যাণ্ডারকে ডেকে বললেন—"ছিঃ ছিঃ, তোমরা না ইংরেজ? একটি মাত্র তরুণ অতগুলি গোরাকে শায়েস্তা করেছে আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যে। এ নিয়ে আবার কথা কি? তোমাদের লজ্জা করে না?" সুট সুট করে সরে পড়ল সাহেবের দল।

সাহেব সায়েস্তা করা যতির পক্ষে এই প্রথম নয়। তখনকার দিনে Fort William-এর কাছে গোরাবাজারে গোরা পল্টনের সাহেবরা দিশী দোকানদারদের সঙ্গে অকথ্য দুর্ব্যবহার করত—হাতের ছড়ি দিয়ে দোকানদারদের দু'চার ঘা লাগান ছিল ওদের এক মস্ত আমোদের ব্যাপার।

ঘটনাক্রমে একদিন তিনি গোরাবাজারের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন একটা গোরা গুনে গুনে দোকানদারদের মাথায় ছিপের ঘা লাগাচ্ছে। আঠাশবার ছড়ির ঘা-মারা শেষ হতেই আর সহ্য হল না যতির। গোরাটার সামনে এসেই গর্জে উঠলেন যতি—"Now it is your turn"—বলেই গোরার মুখে চাপালেন বিরাশি ওজনের এক ছক্কা। সাহেব ত' আচমকা এই আক্রমণে পপাত ধরণীতলে। যতি তৎক্ষণাৎ ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য।

যেখানে অন্যায়-অবিচার সেইখানেই যতির শুধু আবির্ভাবই নয়—সেই অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারও বটে।

বাঘা যতীন

যতি কি করে 'বাঘা যতীন' হলেন এবার শুনুন সে-কথা। ছুটিছাটায় কয়ার বাড়িতে চলে আসতেন যতীন্দ্রনাথ। সেবারও তাই হল। খবর পেয়ে কলুপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজন এসে হাজির। গ্রামের মাতব্বররা নিবেদন করল—"বাঘের জ্বালায় যে ধনেপ্রাণে সাবাড় হতে চল্লুম, কর্তা। আজ বাছুর, কাল ছাগল সমানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সুবিধে পেলে মানুষকেও রেহাই দিচ্ছে না। একটা বিহিত করুন, কর্তা।" গম্ভীর হয়ে চিন্তা করলেন যতি। বললেন—"চল দেখি কি করা যায়!"

যাত্রা হল সুরু। নিঃশব্দে ভোজালিখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যতি। সঙ্গে এক বিরাট বাহিনী। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ঢাক ঢোল বর্শা সড়কি কিছুরই অভাব নেই—সঙ্গে চলল যতীন্দ্রের মামাত ভাই ফণী—হাতে বন্দুক।

উদ্দীপনায় সবাই টগবগ করছে। ছোটখাটো এক যুদ্ধযাত্রা—শত্রুকে শেষ করতেই হবে।

গ্রাম ছেড়ে চলল সবাই সেই জঙ্গলের দিকে যেখানে সেই খুনী বাঘের আস্তানা। তুমুল কাঁসর ঘণ্টা ঢাক ঢোল আর একগাদা লোকের কলরব শুনে তন্দ্রাচ্ছন্ন বাঘের ঝিমুনি গেল কেটে—ব্যাপারটা কী আন্দাজ করবার জন্য বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে—বাঘটার চেহারাটা ভীষণ সুন্দর! বাঘ দেখেই গ্রামের লোকজন কিছুটা পিছিয়ে এল—যতীন্দ্রনাথ ঝোপের আড়ালে যেমন ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। মামাত ভাই দড়াম করে একটা গুলি ছুঁড়ল বাঘকে তাগ করে, কিন্তু গুলিটা মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। আর যায় কোথা! ঘাড় ফিরিয়েই নজরে পড়ল যতিকে—

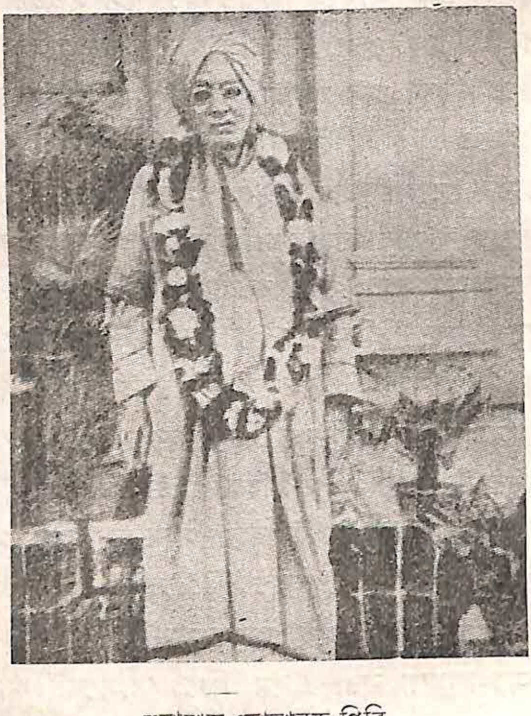
অমনি লাফিয়ে পড়ল তাঁরই উপর। যতি ভোজালি হাতে প্রস্তুত ছিলেন—তাই দিয়ে সজোরে বাঘের মাথায় লাগালেন এক কোপ। ঘা-খাওয়া বাঘ ক্ষেপে গিয়ে যতির পায়ে কামড় বসাল। বেপরোয়া যতি তখন বাঘটাকে সমানে কোপাতে লাগলেন, কিন্তু এই রক্তাক্ত যুদ্ধ আর কতক্ষণ চলা সম্ভব? বাঘ যেমন রক্তক্ষরণে হীনবল হয়ে এলো—যতির অবস্থাও তদ্রূপ। তিনি হতবল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হাতে-বন্দুক ফণী আর কী করে! গুলি ছোড়ার আর জো কই? রক্তাক্ত বাঘ আর আহত যতি এত কাছাকাছি যে, কার গায়ে যে গুলি লাগে এই আতঙ্কে ফণী বিমূঢ়—সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শেষটায় দেখা গেল, হত বাঘ আর আহত যতি দু'জনাই পড়ে আছে মাটিতে। ছুটে গেল সবাই। যতিকে ধরাধরি করে আনা হল কয়ার বাড়িতে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর নিয়ে যাওয়া হল কোলকাতায়—তোলা হল তাঁর মেজমামা ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শোভাবাজারের বাড়িতে। তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারীর শুশ্রূষায় রাখা হল তাঁকে। প্রায় মাসখানেক চিকিৎসার পর ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ। 'বাঘা যতীন' এই নামে পরিচিত হলেন সারা ভারতবর্ষে। যতীন্দ্রনাথ নিজ হাতে খতম-করা ঐ বাঘের চামড়াটি উপহার দিলেন ডাঃ সর্বাধিকারীকে। ডাঃ সর্বাধিকারী ওঁর চিকিৎসার জন্য একটি পয়সা ত' নিলেনই না, উপরন্তু সানন্দে বললেন—"আমার কী সৌভাগ্য যে যতি ভাল হয়ে উঠেছে। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে ও জিতেছে—এই ছেলেই দেশের মান রাখবে।"

সুস্থ সবল হয়ে কয়া গ্রামে ফিরে আসতেই আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আবালবৃদ্ধবনিতা এই নর-শার্দূলকে দেখতে এলো দল বেঁধে। একেই বলে জীবন্ত দেব-দর্শন! 'বাঘা যতীন'—এই নাম নিয়েই তিনি বেঁচে রইলেন চিরকাল।

তরুণ বয়সে বিবাহ হল যতির। তিনি হলেন আদর্শ পতি

তথা পিতা। এমনই দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তিন বছর বয়সে ওঁদের ছেড়ে চলে গেল অতি আদরের প্রথম পুত্রসন্তান। বাঘা যতীনের কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগল প্রচণ্ড। শোকার্ত চিত্তে অশ্রুমুখী সহধর্মিণীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন দেশ-পরিক্রমায়। যথা-সময়ে এসে পৌঁছলেন ভারতবিখ্যাত সাধু ভোলাগিরির আশ্রমে। এর আগে শোভাবাজারে একবার যতির সাক্ষাৎ হয়েছিল এঁর সঙ্গে।

যতীন্দ্রকে দেখেই ভোলাগিরি বলে উঠলেন, 'আও বেটা, আও!



মহারাজ ভোলানন্দ গিরি

তোমার সব খবরই আমি জানি। তুমি হলে শূরবীর—আপনা হাতে শের খতম করেছ। আরও অনেক কাজ তোমাকে করতে হবে।' ভোলাগিরি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন যতীন্দ্রকে। ইঙ্গিতে

এমন কথাও জানালেন যে, পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য অনেক কিছু করতে হবে যতীনকে।

অবনতমস্তকে সাধুর আশীর্বাদ শিরোধার্য করে যতি বিদায় নিলেন আশ্রম থেকে। আর দেরী নয়—এবার পুরোপুরি ঝাঁপ দিতে হবে কর্মযজ্ঞে।

প্রস্তুতি পর্ব

প্রতিটি মহান কাজের জন্য চাই প্রস্তুতি। যজ্ঞের জন্য চাই সমিধ—তারও পূর্বে উপযুক্ত বেদী। সার্থক মন্ত্রোচ্চারণের উদ্গাতা চাই।

এখানে তাই সংক্ষেপে বাংলার বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বের কথা বলা একান্তই প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই বাংলাদেশে বিপ্লববাদের সুরু। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মূলে যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি বহুব্যাপক। লোকচক্ষুর অন্তরালে বিদ্রোহের আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। 'সিপাহী বিদ্রোহ' কথাটি হীনতাব্যঞ্জক। ওটা ইংরেজের দেওয়া নাম—ভারতের নপুংসক ইতিহাসের পাতায় ব্যবহার করে চলেছে তথাকথিত ইতিহাসের তোতাপাখীরা। পরবর্তী কালে Anarchist, Terrorist কথাগুলিও ইংরেজ ঐ অপবাদসূচক অর্থে ব্যবহার করে, এবং বাংলার মোসাহেবরা—যাদের পদলেহনের প্রবৃত্তি প্রবল সেই কাপুরুষের দল, তারাও নতমস্তকে স্বীকার করে নেয়।

নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপি, কুমার সিংহ, রাণী লক্ষ্মীবাই—এঁরা কি সিপাহী? ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রতিটি বিন্দু রক্ত দান করেন এঁরাই। কালের কষ্টিপাথরে এঁরা উজ্জ্বলতম হিরণ্ময় সত্তা—স্বাধীনতার পূজারী—শ্রেষ্ঠ মহত্তম বিপ্লবের প্রাণবহ্নি। মনে কি পড়ে না সেই বিপ্লবী ব্রাহ্মণ যুবক

মঙ্গল পাণ্ডেকে, যিনি সিপাহী-বিপ্লবের মুখ্য নায়ক হিসাবে ব্যারাকপুরের অশ্বত্থগাছে ফাঁসির রজ্জু নিজকণ্ঠে ধারণ করে প্রথম শহীদ হন। কই আমরা ত' তাঁকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানাতে শিখলাম না আজও! বিদ্রোহী-নেতা তাঁতিয়া তোপিও ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ আহুতি দেন। নানাসাহেবকে ত' খুঁজে পাওয়ার সাধ্যই হল না ইংরেজের।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে মুক্তির বীজ অঙ্কুরিত হতে লাগল ভারতের বুকে। রচিত হল বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'। স্বামী বিবেকানন্দের রচনা উদ্দীপ্ত করতে লাগল বাংলার তরুণদের। ভগিনী নিবেদিতা গোপনে বোমা-তৈরীর ফরমুলা যোগান দিতে লাগলেন। এর আগে অ্যানি বেসান্ট-ও পুলিশের নজরে পড়েছিলেন।

ওদিকে লোকমান্য তিলক মারাঠা দেশকে জাগিয়ে তোলেন; শুরু করেন গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব।

১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দ ঠাকুরসাহেবের 'গুপ্ত সমিতি'র সভ্য হন, আর বাংলাদেশে ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র ঋষি বঙ্কিমের প্রেরণা লাভ করে ঐ একই সালে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির অনেকেই তখন বেলুড়-মঠে যাতায়াত করতেন, কারণ ওখানে তাঁরা সানন্দ উপদেশ লাভ করতেন বিবেকানন্দের কাছে। যুবকদের যে-সব বই যোগান দিতেন ভগিনী নিবেদিতা, তার মধ্যে ছিল আইরিশ-বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাস, ইতালির মুক্তিদাতা ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী, রমেশ দত্ত, ডিগবি, দাদাভাই নৌরজির অর্থনীতির বই ও অধ্যাপক ওকাকুরার বই। এই ওকাকুরা একবার কোলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখন শিক্ষিত ও অভিজাতদের মধ্যে ভারত-মুক্তির মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে যান।

বাংলার কোমল মৃত্তিকায় বিভিন্ন মতবাদের বীজ বরাবরই উপ্ত হয়ে আসছে। এখানে তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, সহজিয়া, মরমিয়া, বৈষ্ণব,

বাউল, আরও কত না ভাব-বিপ্লবের সমাবেশ। এরই সঙ্গে যুক্ত হল দেশকে পরবশতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা।

অভ্যুদয় ঘটল শ্রীঅরবিন্দের। বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামের বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতারূপে কর্মক্ষেত্রে টেনে আনলেন। এদিক থেকে তাঁকে বিপ্লব-গঙ্গার ভগীরথ বলা চলে। শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। বৈপ্লবিক সংগঠনের সুবিধার জন্য তিনি বরোদার উচ্চ বেতন তথা সম্মানের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে কোলকাতায় চলে আসেন। এই সময় আবার লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ। জন্ম নিল প্রবল স্বদেশী আন্দোলন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, অশ্বিনীকুমার দত্ত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতি-বর্জন আন্দোলন এমনভাবে গড়ে তুললেন যে, ইংরেজকে হার মানতে হল। আনন্দে উৎসাহে বাঙ্গালী সেদিন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নূতন নাম দিলেন 'Surrender not Banerjee'। লর্ড কার্জন বলেছিলেন : "Partition of Bengal is a settled fact." সুরেন্দ্রনাথ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "We shall unsettle the settled fact." এ-ছাড়া পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক ও বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল প্রচণ্ড স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুললেন। সংক্ষেপে 'লাল-বাল-পাল' বলতে তখন এই তিনজনাকেই বোঝাত। এই চরমপন্থী তিন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন শ্রীঅরবিন্দ।

অরবিন্দের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে 'গুপ্ত সমিতি'র আন্দোলন ভীষণভাবে দানা বেঁধে উঠল। বাংলার বাইরে বিপ্লবী সংস্থার ভার নিলেন বিশ্ববিপ্লবী রাসবিহারী বসু নিজের হাতে। ইনিই সেই রাসবিহারী বসু, যিনি নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমগ্র ভার সানন্দে সমর্পণ করে দেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যিনি



সুভাষচন্দ্র বসু

জাপানে আত্মগোপন করেন এবং ইংরেজের হাত এড়াবার জন্য সানন্দে জনৈক জাপানী মেয়ের পাণিগ্রহণ করেন। এইভাবে নিজ দেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাপানী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষ থেকে স্বেছায় আত্মগোপন করার পূর্বে ইনিই ছিলেন আমাদের বাঘা যতীনের মন্ত্রদাতা ও বিপ্লবী গুরু। আমরা আজ পর্যন্ত প্রয়াত রাসবিহারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি—এমনি হতভাগা আমার এই দেশ!

আমরা আগেই বলেছি, বিরাট কাজে নাবার আগে চাই পরিপূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি। বাঘা যতীন একবার পত্নী ইন্দুবালা ও দিদি বিনোদবালাকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং যান। কৌতুক ও আনন্দপ্রিয় যতি একদিকে যেমন দিদির সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে রত, তেমনি আবার সন্ধ্যায় বসতেন তরুণ যুবকদের নিয়ে গীতার ক্লাস করতে। গীতার ব্যাখ্যা করার সময় কয়েকটি তরুণের

মনে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করার জন্য শত্রুনাশের যে উপদেশ দিয়েছেন, তার সঙ্গে বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের অহিংস প্রেমধর্মের মিল কোথায়? গীতার কথা মেনে নিলে ত' প্রেমধর্মের প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্নটি ভাবিয়ে তুলল যতীন্দ্রনাথকে। তিনি দেখা করলেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "বহুকাল ধরে পরবশ থেকে আমাদের মজ্জায় ধরেছে স্থবিরতা। এই স্থবিরতাকে ঘোচাবার জন্য চাই পরোক্ষ শোষণের বদলে প্রত্যক্ষ প্রতিশোধ। অতএব অস্ত্রের প্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। গীতাই হবে আমাদের আদর্শ।"

ব্যস্, মনস্থির করে ফেললেন যতি। অরবিন্দের সঙ্গে যৌথ-ভাবে গড়ে তুললেন 'ছাত্র ভাণ্ডার'। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হলেও এর যা-কিছু আয় তা লাগান হত বিপ্লবী কর্মীদের সাহায্যকল্পে। আলিপুর বোমার মামলার সময় এই ছাত্র-ভাণ্ডারের কর্মীদের নিয়ে তৎপর হয়ে ওঠেন যতীন্দ্রনাথ। শ্রীঅরবিন্দের মত নেতা ও বিপ্লবী কর্মীদের মামলা চালাবার খরচ বহন করত এই ছাত্র-ভাণ্ডার। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল আরও অনেক। তার মধ্যে প্রধান হল অত্যুৎসাহী সরকারী কর্মচারীদের প্রকাশ্যে দণ্ডদান এবং বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে নবপর্যায়ে উন্নীত করা। বাঘা যতীনের পরিচালনায় নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটে যায় একটির পর একটি:

১। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর পুলিশ-কর্মচারী নন্দলাল বাঁড়ুজ্যেকে হত্যা; অপরাধ—প্রফুল্ল চাকিকে ধরিয়ে দেওয়া।

২। ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯ সাল—সরকারপক্ষের উকিল আশু বিশ্বাসকে হত্যা। কোলকাতার হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে শহীদ চারু বসু এই কাজ সমাধা করেন।

৩। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১০ সালে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন-টেণ্ডেন্ট কুখ্যাত সামসুল আলমকে গুলি করে হত্যা করেন বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত।

আরও আগের কথা। ১৯০৬ সাল। বাঘা যতীনের সঙ্গে মিলিত হন তারক দাস, অধর নস্কর, শ্রীশ সেন ও সত্যেন সেন। এই সময়েই বিদেশ যাত্রা করেন প্রথমে তারক দাস এবং অল্পকাল পরেই বাকি তিনজন। যতীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে এঁরা সকলেই বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অনুকূলে বিপ্লবী সংগঠনের প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

দেখতে দেখতে ১৯১৪ সালের ভারতবর্ষের অবস্থা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সহায়ক হয়ে দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমুপস্থিত। সারা ভারতের বিপ্লবীরা প্রস্তুত হতে সুরু করলেন সাজ-সাজ রবে। ব্রিটিশরাজ তখন ইয়োরোপ-খণ্ডে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে তৎপর। ভারতের নওজওয়ানরা, যাঁরা বিপ্লবী সংগঠনের নায়ক, তাঁরা স্থির করলেন ব্রিটিশের এই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে ব্রিটিশ শিবিরে ভারতীয় ফৌজীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার বীজ বপন করে দেবেন। আর, করলেনও তাই। সশস্ত্র সেনাদল কথা দিলেন উপযুক্ত সময়ে তাঁরাও পিছিয়ে থাকবেন না। একদিকে রাসবিহারী ও পূর্বাঞ্চলে যতীন্দ্রনাথ সর্বময় নেতা হিসেবে সংগঠনের পূর্ণকাজে আত্মসমর্পণ করলেন। এমন-কি সাঁওতাল ও আদিবাসীরাও প্রস্তুত হয়ে গেল। বিপ্লবীদের তরফ থেকে দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। সেই শুভলগ্নেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ সেনানিবাসগুলির ওপর। তারপর যুদ্ধে জয়ী হয়ে উত্তর ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেবে। রচিত হল আফগানিস্তান হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত এক বিরাট যোগাযোগ ব্যবস্থা। জলে স্থলে সর্বত্র এক বিরাট সংগ্রামী প্রস্তুতি। কোথাও কোন ফাঁক নেই। প্রতিটি সৈন্যের জন্য স্বাধীন ভারতের প্রতীক-চিহ্ন-সংবলিত পোশাকও প্রস্তুত। ভারতের বাহির হতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, গদর আন্দোলনের নেতা সর্দার অজিত সিং, আর ভারতের চারদিকে

কাবুল, সিঙ্গাপুর, বর্মা ও দ্বীপময় ভারতের ছোটবড় রাজ্যগুলি মহানায়ক রাসবিহারী ও যতীন মুখার্জীর পরিচালনায় প্রস্তুত হয়ে উঠল। ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে বৈদেশিক রাষ্ট্রের জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই হয়ে দূর-দূরান্তর থেকে রওয়ানা দিল। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তি ঘুমিয়ে ছিল না ; তার গোপন গোয়েন্দা-বিভাগ ছিল সদা-তৎপর।

প্রথম কারাবরণ

সামসুল আলমের হত্যার পর এ-ব্যাপারে বাঘা যতীনকে সরাসরি জড়াতে না পেরে, হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে আসামী করা হয়। ১৯১০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী যতীন যখন গ্রেপ্তার হন তখন তিনি রাত জেগে এক রোগীর সেবা করছিলেন। ১৯১১ সালে কারাগার থেকে মুক্ত হলেন বাঘা যতীন, কারণ আইনতঃ তাঁকে অভিযুক্তই করা যায়নি। কিন্তু হলে হবে কি! সরকারী নথিপত্রে তাঁর নাম উঠল এবং তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হল, তা অতি মারাত্মক ; বলা হল, এই একটি মাত্র লোকই সব-কিছুর জন্য দায়ী। কথাটি মিথ্যে নয়, কারণ যা-কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনা তখনকার দিনে ঘটেছে তার সব-কিছুর মূলেই যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ও কৌশল।

ইতিপূর্বে দল-গঠনের কাজে সুবিধের জন্য হুইলার সাহেবের অধীনে অমন সুন্দর চাকুরিটিতে পর্যন্ত ইস্তফা দিতে বাঘা যতীন এতটুকু পিছপাও হলেন না। সত্যি বলতে কি, সারা ভারতের বিক্ষিপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগ্রথিত করার ভারও এসে পড়েছিল এই যতিরই উপর। অরবিন্দের ঋষিদৃষ্টি মিথ্যে নয়। চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরী যাবার আগে তিনি সকলকে বলে যান "যে কর্ম সূচিত রেখে গেলাম তার অগ্রগতি বিধিনির্দিষ্ট" এবং ঐ একই প্রসঙ্গে নির্দেশ দিয়ে যান "যতীনকে নেতা বলে জেনো"।

কোলকাতার গুপ্ত সমিতির নেতৃত্ব অতুলকৃষ্ণের হাতে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ যশোহর-ঝিনাইদ রেলওয়ে নির্মাণের ঠিকাদারির কাজ নিয়ে চলে আসেন মফস্বলে। আসল উদ্দেশ্য, গ্রামাঞ্চলে গুপ্ত সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা, যাতে প্রয়োজনের সময় এক ডাকে সবাই মিলে সাড়া দিতে পারে। এই সুযোগে তিনি বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কখনো ঘোড়ায়, কখনো সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াতে সুরু করলেন। বস্তুতঃ ১৯০৬ সাল থেকে এই কাজের সুরু।

ওদিকে উত্তর ভারত থেকে রাসবিহারী বসুও তাড়া দিতে লাগলেন। যতির সঙ্গে তাঁর ভাবের ও সংবাদাদির আদানপ্রদান চলতে লাগল। ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে উভয়ের মিলন ঘটেছিল। বাঘা যতীন রাসবিহারীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, অভ্যুত্থানের দিনে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দখল করা সম্ভব হবে কিনা। রাসবিহারী একবাক্যে উত্তর দিলেন "নিশ্চয়ই"। দুজনের চেষ্টায় বাংলা থেকে পাঞ্জাবে প্রকাশ্য গণ-অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা সফল করার অন্তিম চেষ্টা করা হল।

ওদিকে আমেরিকার 'গদর' (বিদ্রোহী) পার্টি ও জার্মানীর সহযোগিতায় গঠিত 'বার্লিন পার্টি' বিপ্লবী পরিকল্পনার নীতি অনুসারে বিশেষ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হতে সুরু করল। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে চললেন তারকনাথ দাস, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মানবেন্দ্র রায়। বিদেশ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সমেত রওয়ানা হবার পাকা খবর নিয়ে কয়েক-বার যাতায়াত করতে লাগলেন দূত হিসাবে সত্যেন সেন, শ্রীশ সেন। বাঘা যতীনের পরামর্শে ভোলানাথ চাটুজ্যে গেলেন গোয়ার নিকটে নোকর্নী অঞ্চলে, আর ডাঃ যতীন ঘোষাল ও ও হরিকুমার চক্রবর্তী সুন্দরবনে। উদ্দেশ্য—জাহাজ থেকে মাল খালাস করে নেওয়া।

সেদিন গেরিলা যুদ্ধের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ তা এইরকম ঃ

১। বহু জায়গায় রেল-লাইন তুলে ফেলা এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া।

২। বালেশ্বরের চণ্ডীপুর গ্রামটি ছিল বঙ্গোপসাগরের উপর। ওখানে কামানের গোলা পরীক্ষার জন্য ইংরেজ সৈন্যদের একটা আড্ডা ছিল। স্থির হল, আকস্মিক আক্রমণে এদের স্তব্ধ করা এবং জার্মান অস্ত্র যা বালেশ্বরে নাবান হবে, সঙ্গে সঙ্গে তারও ব্যবহার।

৩। ঠিক করা হল, চক্রধরপুরের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে লড়কা কোল অর্থাৎ লড়াইয়ে কোলদের মধ্যে ঐ অস্ত্র ছড়িয়ে দেওয়া। ওরা ইতিপূর্বে সশস্ত্র বিদ্রোহে একবার ওদের দক্ষতা প্রতিপন্ন করেছিল।

৪। অজয় নদীর পুলটিকে উড়িয়ে দেবার ভার দেওয়া হল সতীশ চক্রবর্তীর ওপর।

৫। সুন্দরবনে জাহাজ থেকে মাল খালাস করে এক ভাগ পাঠান হবে বালেশ্বরে, এক ভাগ পূর্ববঙ্গের সন্দীপ ও হাতিয়ায়, বাকি এক ভাগ দেওয়া হবে পশ্চিম বাংলাকে, সুন্দরবনের ভার দেওয়া হবে প্রতাপাদিত্যের বংশধর যতীন রায়ের ওপর। উনি ওখানে প্রচুর লোক ও নৌকা নিয়ে তৈরী থাকবেন।

৬। শত্রুসৈন্য যাতে চলাচল না করতে পারে তার জন্য EIR, BNR ও EBR-এর কয়েকটি রেল-পুল উড়িয়ে দেওয়া হবে।

৭। কোলকাতার Fort William-এর ওপর ভারতের মুক্তি-পতাকা উত্তোলিত করা হবে।

৮। স্থির হল, শ্যাম দেশ থেকে জাতীয় সেনাদল বর্মা আক্রমণ করবে। বর্মা তখন ভারতেরই একটি প্রদেশ। বর্মার লোকরাও নিজ দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে।

সত্যি বলতে কি, ভারতের মুক্তি-আন্দোলন বহুদিনের। মনে

করুন, সেই ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস। আমেরিকা থেকে অস্ত্র-বোঝাই জাপানী জাহাজ 'কোমাগাটামারু' অগ্রসর হচ্ছিল অথৈ নীল সাগরের বুক বেয়ে। এর যাত্রী মারাঠী ও বাঙালী বিপ্লবীরা। কোলকাতা আর বেশী দূরে নয়—'মুক্তি' 'মুক্তি' 'মুক্তি' ঐ আকাশের মত উদার, সমুদ্রের মত গম্ভীর!

সামনে বজবজ। শীতের রাত্রি শেষ হবার আর বিশেষ দেরী নয়। আচম্বিতে একি! ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে বিদ্ধ করতে লাগল জাহাজটিকে। ব্রিটিশ ফৌজের গুলি। ঘুমভরা চোখে বিপ্লবীরা অস্ত্র হাতে দাঁড়াল, কিন্তু সেই অসম যুদ্ধে কত বিপ্লবীর প্রাণহীণ দেহই না সেই জাহাজের ডেকে লুটিয়ে পড়ল!

বাঘা যতীন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা। বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী সংস্থাগুলিকে যতীন্দ্র-নাথ জোরদার করে তুলতে লাগলেন। 'গদর' শব্দের অর্থ 'বিদ্রোহী'। এই দলের নায়ক পিংলের সঙ্গে যতির যোগাযোগ ঘটল রাসবিহারীর মাধ্যমে। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, বীর সাভারকার ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইউরোপে বিপ্লবী দল গড়ে তুললেন। বার্লিনে ভারতীয় ছাত্র ও ব্যবসায়ীরা মিলে গঠন করলেন 'বার্লিন কমিটী', আমেরিকা ও কানাডায় 'গদর পার্টি' গড়ে তুললেন ভাই পরমানন্দ, হরদয়াল ও অধ্যাপক বরকতুল্লা।

বর্মাতে তখন বহু ভারতীয় বাস করতেন। তাঁদের সুবিধার জন্য 'গদর' পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল হিন্দী, মারাঠী, উর্দু, গুজরাটী ও গুরুমুখী ভাষায়। বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে উঠল সিঙ্গাপুর, বাটাভিয়া, ব্যাঙ্কক, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে। বহু পাঞ্জাবী ও ভারতীয় মুসলমান এইসব সংস্থায় স্বেচ্ছায় যোগ দেন।

এদিকে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহী সংগঠনের কল্পনাকে কার্যকরী করে তোলেন বাঘা যতীন। ১০নং জাঠ রেজিমেণ্টের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন। সন্দেহক্রমে ব্রিটিশ সরকার এই

রেজিমেন্টকে ভেঙে দেয়। কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামেও তিনি একদল সৈন্যকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করে রাখেন।

ওদিকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কাবুলে অস্থায়ী 'স্বাধীন ভারত সরকার' গড়ে তোলেন। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুর্কী প্রভৃতি দেশ এই সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছিল।

এদিকে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বিদ্রোহী সৈন্যরা একটানা ছয় দিন 'স্বাধীন রাজ্য' স্থাপন করে রাখেন।

এইসব বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে কিন্তু যোগসূত্রের স্বর্ণসূত্রটি ছিল আমাদের বাঘা যতীনেরই হাতে। কাশীতে রাসবিহারীর সঙ্গে আলোচনা হল বাঘা যতীনের। নিশ্চিতভাবে জানা গেল, ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ উত্তর প্রদেশ্ ও পাঞ্জাবের সৈন্যরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কৃতসঙ্কল্প। কোলকাতায় ফিরে এসেই বাঘা যতীন আদেশ দিলেন ঃ "এক মাসের মধ্যেই চাই এক লক্ষ টাকা।"

নরেন ভট্টাচার্যের (এম. এন. রায়) নেতৃত্বে চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন ও রাধাচরণের সমবেত অভিযানে গার্ডেনরীচে বার্ড-কোম্পানীর আঠার হাজার টাকা লুট করা হয়। ট্যাক্সি-ড্রাইভারের হাত-পা বেঁধে রাধাচরণ ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসেন, কিন্তু নরেন ভট্টাচার্য ট্যাক্সিতে না ফিরে, ঘোরা-পথে আসতে গিয়ে পুলিশ-ইনস্‌পেক্টর সুরেশ মুখুজ্যের হাতে ধরা পড়েন। খবর পাওয়া গেল নরেনকে লালবাজারে নেওয়া হয়েছে। বাঘা যতীন নির্দেশ দিলেন, লালবাজার থেকে যখন নরেনকে আলিপুর জেলে নেওয়া হবে তখন তাঁকে প্রিজন-ভ্যান থেকে ছিনিয়ে আনা হবে।

যতির এই আদেশ পালনের জন্য 'মসার' পিস্তল হাতে প্রস্তুত হলেন পাঁচুগোপাল বাঁড়ুজ্যে, সতীশ চক্রবর্তী, জগা দত্ত, লাড্‌লি মিত্র ও সাতকড়ি বাঁড়ুজ্যে। কিন্তু কিছু করা গেল না, কারণ অসুস্থ বোধ করায় নরেনকে (এম. এন. রায়) আগেই আলিপুরে নেওয়া হয়ে গেছে।

যতীনের কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। নরেনকে তাঁর চাই-ই চাই। ডাঃ যাদুগোপাল প্রস্তাব দিলেন, নরেনকে সম্ভবতঃ জামিনে খালাস করে আনা চলে। পাবলিক প্রোসিকিউটর তারক সাধুর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের জানাশোনা ছিল। বিপদ ঘাড়ে নিয়েও যতি তাঁরই পরামর্শমত স্থির করলেন, কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে এই ডাকাতির দোষ গ্রহণ করে, তবেই নরেনের জামিন সম্ভব। রাধাচরণ প্রামাণিক আগেই ধরা পড়েছিলেন। জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই প্রস্তাব দিতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। নরেন ভট্টাচার্য জামিনে খালাস পেলেন।

এদিকে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী যে সৈন্যবিদ্রোহ হবার কথা ছিল, তা ব্যর্থ হল কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায়। এ-অবস্থায় বাংলার কী করা উচিত তারই পরামর্শের জন্য যতীন্দ্রনাথ, নরেন ভট্টাচার্য ও অন্তরঙ্গ আরও কয়েকজন গোপনে মিলিত হলেন ৭৩নং পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে। এই বাড়িটি আসলে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল চিত্তপ্রিয়দের লুকিয়ে রাখার জন্য। আলোচনা চলছে, এমন সময় নীরদ হালদার নামে গোয়েন্দা এসে হাজির। যতিকে সে আগে থাকতেই চিনত। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনও হদিস না পেয়ে মনে করেছিল, হয় যতীন্দ্রনাথ মারা গেছেন বা বিদেশে গা-ঢাকা দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথকে দেখেই নীরদ হালদার যেই চমকে উঠে বলে ফেললো, 'আরে, যতীনবাবু যে!'—অমনি গর্জে উঠল চিত্তপ্রিয়র পিস্তল—সোজা গুলি লাগল নীরদ হালদারের বুকে। নীরদকে মৃত ভেবে সবাই সরে পড়ল ঐ আস্তানা ছেড়ে। নীরদ কিন্তু তখনো মরেনি। পুলিশ তাকে নিয়ে গেল মেয়ো হাসপাতালে। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে সে বলে গেল: যতীন মুখার্জীই গুলি করেছে তাকে।

বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে পুলিশ বাঘা যতীনের নামে হুলিয়া বার করল—ছড়িয়ে দিল সারা বাংলায়—"Yotin

Mukherjee shot Nirod Halder dead. Have a sharp look out."

অবস্থা সঙ্গীন। ওদিকে সৈন্য-বিদ্রোহ বানচাল, এদিকে যতীন্দ্রের নামে হুলিয়া। যতীন্দ্রনাথ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বললেন, "আমার এখনকার কাজ শেষ, ধরা পড়ে আর বিদেশীদের আদালতে নয়। শত্রুকে যথাসম্ভব শেষ করে নিজেও শেষ হতে চাই।" মনে পড়ল মাতৃসমা একমাত্র দিদি বিনোদবালা দেবীর কথা। শেষবারের মত বিদায় নেবার সময় এই তেজস্বিনী দিদি বলেছিলেন—"সিংহকে দ্বিতীয়বার যেন পিঞ্জরাবদ্ধ না দেখি।"

কোলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তার ফলে ইংরাজ ও তাদের অনুচররা ত্রাসে কেঁপে ওঠে। এর মূলে যা কৃতিত্ব সবই আমাদের বাঘা যতীনের। তাঁরই নেতৃত্বে ও নির্দেশে ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে থাকে।

আর কিন্তু কোলকাতায় থাকা চলে না, রাসবিহারী বসু চলে গেলেন দেশত্যাগ করে সুদূর জাপানে, অরবিন্দ ফরাসী পণ্ডিচেরীতে, আর বাঘা যতীনকে যেতে হল উড়িষ্যার উপকূলে।

ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর খেলা যে, অস্ত্র-বোঝাই 'ম্যাভারিক' জাহাজ থেকে মাল নাবিয়ে নিয়ে সেই অস্ত্রই ব্যবহার করা হবে ইংরেজের বিরুদ্ধে—এইরকমই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু ঐ জাহাজটিই কিনা ধরা পড়ে গেল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র সব ওরা ডুবিয়ে দিল সমুদ্রের জলে।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসে বাঘা যতীন কোলকাতা ত্যাগ করেন। যে আস্তানায় তিনি প্রথমে গিয়ে হাজির হন তার নাম 'গোপাল-ডিহা'। এই গোপালডিহার 'গোপাল' আর কেউ নন—বিপ্লবী নলিনী কর। মঙ্গলডিহা মৌজার মালিক যতীন্দ্রনাথের ভক্ত মণি চক্রবর্তী গোপালকে কিছু জমি দেন। সেখানেই গোপাল

আস্তানা গড়ে তোলেন। চিত্ত, নীরেন, মনোরঞ্জন ও যতীশ একই সঙ্গে তালডিহায় আরও একটি ঘাঁটি করেন।

ওদিকে পুলিশের বড়কর্তা ডেনহ্যাম চুপ করে বসে ছিলেন না মোটেই। তিনি হানা দেন বালেশ্বরের 'ইউনিভার্সাল এমপোরিয়ামে'। সেখানে একটুকরো কাগজে কাপ্তিপাদার নাম পান। ব্যস্। তিনি বালেশ্বরের সশস্ত্র পুলিশ, নীলগিরি রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ ও ময়ূরভঞ্জের সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে হাজির হন কাপ্তিপাদার ডাক-বাংলোয়। সাহেবরা গিয়েছিলেন হাতী চেপে। হাতীর পিঠের ঘণ্টা শুনে স্থানীয় একটি লোক যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের খবর দেয়। বালেশ্বর পুলিশ গ্রেপ্তার করে শৈলেশ্বর বোস, নিমাই ও আবগারী বিভাগের কর্মচারী নারায়ণ ব্রহ্মচারীকে। কাপ্তিপাদায় হাজির হন বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি, ডেনহ্যাম, বার্ড ও টেগার্ট।

যতীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিপদের ঝুঁকি নিজের কাঁধে নিয়ে নদী পার হয়ে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলেন—এত রাত্রে এই জঙ্গলে আর কেই-বা আসতে পারে—নিশ্চয়ই ওরা ওই সাহেব-পুলিশের দল। যতীন্দ্রনাথ ফিরে এসে সবাইকে সাবধান করে দিলেন: তখ্খুনি ঐ জায়গা ছাড়তেই হবে। বাঘা যতীনকে ওখানকার লোকরা বলত 'সাধুবাবা'। তিনি জঙ্গলের গভীরে বসে একমনে গীতাপাঠ করতেন—পরনে গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গ্রাম-বাসীদের আপদে বিপদে সাহায্য করাই ছিল তাঁর চিরকালের অভ্যেস। রোগীর সেবা করতেন হোমিওপ্যাথি দিয়ে, কখনও বা প্রাকৃতিক পন্থায়। টিঞ্চার আওডিন, কুইনিনের ব্যবহারও তিনি জানতেন। তাঁরই কাছে ছিলেন মনোরঞ্জন ও চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। নীরেন দাশগুপ্ত আর যতীশ পাল ছিলেন বারো মাইল দূরে কাপ্তিপাদায়।

যতীন্দ্রনাথ মণিদাকে সাবধান করে দুই সঙ্গীকে নিয়ে ভোরের দিকে তালডিহির পথ ধরলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর সকালেই ময়ূরভঞ্জের মহকুমা হাকিম অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠালেন ডেনহাম। তাঁর সঙ্গে বিহারের গোয়েন্দা বিভাগের ডি.আই.জি. রাইল্যাণ্ড (Ryland)। একজন স্থানীয় লোককে পাঠানো হল দেখে আসতে বাবুরা আছে কিনা। সে সব ফাঁকা দেখে এসে খবর দিল। সাহেবরা বিশ্বাস করলেন না—পাঠালেন আর-একজনকে। সেও ফিরে এসে ঐ একই খবর দিল। ডাক পড়ল স্বয়ং মণিবাবুর। তিনি বললেন, জঙ্গলে ঠিকাদারির কাজ করতে এসেছিল কয়েকজন—তাদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তারা এখন কোথায় তিনি জানেন না।

এবার সাহেবরা সদলবলে আশ্রমে গেলেন। যাবার আগে অক্ষয়কুমারকে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, আশ্রমে কোন বিপদ আছে কিনা। কে বাবা সাহস করে ঐ নরশার্দূলের আস্তানায় হানা দেবে! খানাতল্লাসি করে বাঘা যতীনের নিজের হাতে লেখা একখানা ডাইরি পাওয়া গেল। এই ডাইরির লেখা পড়ে সাহেবরা বলেছিলেন: "যে লোক এত উচ্চচিন্তা করতে পারে, সে একজন বিশ্ব-নেতা হবার যোগ্য।"

মণিদার বাড়িতে সশস্ত্র পাহারা রেখে সাহেবরা সদলবলে বালেশ্বরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

রাত আন্দাজ এগারটা নাগাদ বাড়ির পিছনের জানালার নীচে কার গলার চাপা আওয়াজ: 'দাদা! দাদা!' মণিদা শুনেই বুঝলেন বাঘা যতীনের কণ্ঠস্বর! কী সর্বনাশ! ভোরে চলে গিয়েই আবার এখ্‌খুনি ফিরে এলো? যতি বললেন, 'পঞ্চাশটা টাকা দাও—হাতে কিছু নেই।' মণিদা ওঁদের গচ্ছিত টাকা দিলেন। ঐ সঙ্গে দিলেন একটি বন্দুক। মণিদা আরও বলে দিলেন—'মেঘাসণি পাহাড়ের কোলে কোলে চলে যাও। ওদিকটায় বিপদ কম।'

আর দেরী নয়। রওয়ানা দিলেন বালেশ্বরের পথে। এসপার কি ওসপার! কবির ভাষায়:

এই শুধু জানিয়াছি সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল
বাঁচি কিংবা মরি!

ইতিমধ্যে ইংরেজ পুলিশরা আরও একটি কাজ করে রেখেছিল। গ্রামে গ্রামে প্রচার করে দিল—জার্মান ডাকাত এসেছে, বাঙালী ডাকাত এসেছে—ধরে দিতে পারলে লোক-পিছু হুশো টাকা করে পুরস্কার। লোকদের মধ্যে দেখা দিল চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা।

শেষ অঙ্ক

৮ই অক্টোবর যতীন্দ্রনাথ পৌঁছে গেলেন বালেশ্বর স্টেশনে। দেখলেন একটা ট্রেন অপেক্ষা করে আছে স্টেশনে। তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে গাড়িতে উঠলেন। কিন্তু একি! এত বড় ট্রেনটা এমন ফাঁকা-ফাঁকা কেন? ভালো করে চেয়ে দেখেন, গাড়িটি স্রেফ পুলিশের লোকে ভর্তি। মনে পড়ে গেল মাতৃসমা দিদির আদেশ-বাণী: "সিংহকে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ না দেখি!"

ছিঁড়ে ফেললেন টিকিট, নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে—এগিয়ে চললেন দূরের মেঠো পথ ধরে; প্রথমেই পড়ল হরিপুর গ্রাম, তারপর বুড়িবালামের তীরে গোবিন্দপুর।

ভাদ্র মাসের ভরা নদী। পারের জন্য নৌকো চাই। একটি মাত্র কাঠবাহী নৌকো চোখে পড়ল। তার মাঝি এঁদের পার করে দিল। একজন কিন্তু এদের পাঁচজনকে একসঙ্গে দেখে সন্দেহ করল। লোকটি চুপিসাড়ে সরে পড়ল দফাদারকে ডাকতে।

ততক্ষণে একে একে বহু লোক জড়ো হয়ে পড়ল আশপাশ থেকে। খবর রটে গেল জার্মান ডাকাত এসেছে। বাঘা যতীন একটা

ফাঁকা আওয়াজ করলেন, লোকগুলি পালাল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসতে লাগল।

বেলা এগারটা নাগাদ এঁরা পৌঁছে গেলেন দামুদ্রা গ্রামে। এটা ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সালের কথা।

গ্রামের মাতব্বর রাজ মোহান্তি আর সুদাম গিরি এঁদের পথ আটকাল। মনোরঞ্জন বাধ্য হলেন গুলি চালাতে। আহত হল সুদাম গিরি। লোকজন পালিয়ে গিয়ে দূর থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। দফাদারের ভাই ছুটল বালেশ্বরে খবর দিতে।

এগিয়ে চললো অভিযাত্রীর দল। দু'দিন কিছু পেটে পড়েনি। রাস্তায় একটা খাবারের দোকান। টাকা-দেড়েকের খাবার খেয়ে পাঁচটাকার নোট বকশিস দিয়ে চলে গেলেন ওঁরা। দোকানদার অশেষ আশীর্বাদ জানাল।

চরৈবেতি, চরৈবেতি—চল চল, এগিয়ে চল যাত্রীদল অমৃতের অভিসারে! মৃত্যুহীন দেহের এই যে অমৃতোপম অভিযাত্রা, এর তুলনা কই ?—

"মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।"

টাকার লোভ বড় লোভ। আবার জড়ো হতে সুরু করল গ্রামবাসীরা। অনুনয়, বিনয়, শুভ ইচ্ছার প্রকাশ—সব বৃথা! একজন আবার এগিয়ে এসে জাপ্‌টে ধরল বাঘা যতীনকে। তিনি এক ঝটকায় তাকে দিলেন ফেলে। আর সহ্য করা যায় না! মনোরঞ্জন গুলি চালাতে বাধ্য হলেন। হত এক, আহত অনেক। তখন লোভ আর সাহস নস্যাৎ! যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

গ্রাম থেকে প্রায় আধমাইল দূরে পড়ল এক নদী। সরকারী প্রচারের ফলে সব নৌকা উধাও। বীর-পঞ্চক মাথায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নদী পেরিয়ে গেলেন। বাঘা যতীন ও তাঁর অনুগামী বীর-চতুষ্টয় এসে গেল এক বিরাট উইঢিপির আড়ালে। প্রকৃতি যেন

নিজ হাতে এই শোণিত-তীর্থের অভিযাত্রীদের আশ্রয়-স্থল রচনা করে রেখেছেন।

বেলা দুটোর সময় বালেশ্বরে পুলিশ-সাহেবের কাছে খবর পৌঁছে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী সহ নিজেই গ্রহণ করলেন অভিযানের ভার। চণ্ডীপুরের রাদারফোর্ড হলেন ব্রিটিশ ফৌজের পরিচালক ; সঙ্গে যোগ দিলেন পুলিশের অন্যান্য কর্তারা— যেমন খোদাবক্স, ডি.আই.জি. রাইল্যাণ্ড। খবর পেয়ে ছুটে এলেন চার্লস টেগার্ট—সঙ্গে অগুনতি পুলিশ-বাহিনী, পাঁচশত মিলিটারি সান্ত্রীর দল।

ঠিক কোন্ জায়গাটিতে যে বীর-পঞ্চক ঘাঁটি গেড়েছেন, বোঝা মুশকিল।

টেগার্ট পরামর্শ দিলেন, গুলি চালাতে চালাতে এগুনো যাক। সেই সশব্দ গোলাগুলির আওয়াজে মনোরঞ্জনের বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হল না যে, শত্রুপক্ষ অগ্রসরমান। হঠাৎ তাঁর নজরে এলো, একটা ভাঙা ডালে জড়ান একটুকরো কাপড় নেড়ে কে যেন দূরবর্তী সৈন্যদের ইসারা দিচ্ছে। মনোরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। কাপ্তিপাদায় থাকাকালে তিনি এই সঙ্কেত-কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। একেই বলে 'সিমাফোর'। এই ফৌজী-নিশানাও যুদ্ধকৌশলেরই একটি অঙ্গ।

সশস্ত্র সরকারী বাহিনী সঙ্কেত বুঝে অকুস্থলে অগ্রসর হতে স্থুরু করল।

দুড়ুম, দুড়ুম, দুড়ুম—সরকারপক্ষের গুলির আওয়াজ! সৈন্যদল এগিয়ে চলল বীরদর্পে। পুরোপুরি যুদ্ধের পরিবেশ। উন্মাদনা প্রবল থেকে প্রবলতর। জাতীয় বীররা কিন্তু চুপচাপ—নেই সাড়া নেই শব্দ! ওঁরা বসে আছেন surface trench-এর আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে, নেতার আদেশের অপেক্ষায়। হাতে তাঁদের সেই মসার পিস্তল, যে পিস্তলগুলিকে কব্‌জির মোচড়ে রাইফেলে পরিণত

করা যায়। এগুলি সেই পিস্তল, যেগুলিকে মলঙ্গা লেনে বিখ্যাত হাবু এনে পৌঁছে দিয়েছিল অনুকূলদা ও বিপিনদাকে এবং তাঁদের কাছ থেকে পৌঁছে গিয়েছিল যতীন্দ্রনাথের হাতে।



অনুকূল মুখার্জী

তখনও ওঁরা অপেক্ষা করে আছেন বাঘা যতীনের আদেশের অপেক্ষায়।

সরকারী সৈন্যরা বুঝে নিল বিপ্লবীদের হাতে দূরপাল্লার অস্ত্র নেই। তাই ওরা আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বীরদর্পে দ্রুত এগুতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ একি! পাঁচশত সৈন্যের সামনে বজ্রপাত! মসার পিস্তল থেকে মারাত্মক গুলির উদ্‌গিরণ হতে লাগল ফটাফট্-ফটাফট্-ফটাফট্! ব্রিটিশ সৈন্যের দল হত ও আহত হতে লাগল মাঠ-ভর্তি ফসলের মত। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে পিছু হটতে বাধ্য

হল ওরা, পিছিয়ে এলেন স্বয়ং রাদারফোর্ড—কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা গুলি—রক্ষা পেয়ে গেলেন অল্পের জন্য। গর্জে উঠল বাঘা যতীনের কণ্ঠ—Fire ! সেনাপতির আদেশ—Fire ! Fire !



বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী

কটাকট্ কটাকট্ কটাকট্—Fire ! Fire ! Fire ! কাটা ফসলের মত ঝরে পড়তে লাগল ইংরেজ পুঙ্গবের দল। মৃত্যুর আর্তনাদ, আহতের গোঙানি : Oh my Gosh ! আর তারই সঙ্গে আগুন আর গুলির ধোঁয়া—একটা পুরোপুরি যুদ্ধাঙ্গন। গর্জে উঠছে বাঘা যতীনের অগ্নিবর্ষী বজ্রকণ্ঠ : Fire ! Fire ! Fire ! কিন্তু একি ! গুলি কই আর ! ফুরিয়ে গেল ? গুলি যে নেই আর ! কোথায় সেই চামড়ার থলে ? যার ভিতর পোরা আছে যত্ন করে রাখা বাড়তি গুলি-কয়টি। হায়রে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা—সেই চামড়ার থলের

চাবি যে কখন পড়ে গেছে নদীতে। কেটে ফেল দাঁত দিয়ে। এমনই শক্ত সেই থলের বাঁধন—দাঁত দিয়ে কাটাই গেল না। এই অবস্থায় হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগল চিত্তপ্রিয়র মাথায়—তিনি এলিয়ে পড়লেন বাঘা যতীনের দেহে। বাঘা যতীন তাঁকে সাদরে নিজের বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, ভুলে গেলেন নিজের অস্তিত্বের কথা। মাথা নীচু করে চিত্তের শির-চুম্বন করে শেষ আশীর্বাদ জানালেন—



বুলেট-বিদ্ধ যতীন্দ্রনাথ

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি গুলি এসে লাগল তাঁর ডান বগলে। ছিন্ন ফুলের মত ঝরে পড়ল চিত্তর অসাড় দেহ। পড়ে গেলেন স্বয়ং বাঘা যতীন!

চিত্তপ্রিয় মায়ের পায়ে নিবেদিত প্রথম রক্তজবা।

যতীন্দ্রনাথের প্রচুর রক্তক্ষরণ চলেছে, তাঁকে তড়িদ্‌গতিতে নেওয়া হল বালেশ্বর হাসপাতালে।

ইংরেজের বিচারে ফাঁসি হল মনোরঞ্জন আর নীরেনের। অত্যধিক শারীরিক নির্যাতনে প্রাণত্যাগ করেন জ্যোতিষ।

বুড়িবালামের তীরে এই যে অসীম বীরত্বপূর্ণ অসম যুদ্ধ হয়েছিল, তার ফল কিন্তু ফলেছিল সারা ভারতব্যাপী। বিশেষ করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা ত' ভারতের ইতিহাসে চিরকাল উচ্চারিত হবে সগৌরবে, এই বুড়িবালামেরই রণাঙ্গনের মত। একদিকে বুড়িবালাম আর অপরদিকে জালালাবাদ পাহাড়। সব-কিছুর মূলেই আমাদের এই বাঘা যতীন। ওদিকে মাস্টারদা সূর্য সেন আমাদের বাঘা যতীনেরই প্রতিরূপ। আরও বৃহত্তর পটভূমিকায় আমাদের নেতাজী সুভাষচন্দ্র—সমগ্র এশিয়ার মুক্তিদাতা হিসেবে ঘটেছিল যাঁর আবির্ভাব। স্বয়ং আমেরিকান সেনানায়ক আইজেনহাওয়ার এই কথা স্বীকার করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পেলে, মুক্ত এশিয়ার ছত্রপতি হিসাবেই পাব আমরা তাঁকে। এশিয়াতে আমাদের খবরদারি আর চলবে না।"

বাঘা যতীনের মহাপ্রয়াণকে আমরা স্বীকার করি না, যেমন করি না নেতাজীর অদৃশ্য হওয়াকে। যতীন্দ্রের সহধর্মিণী ইন্দুবালা কোনদিনই স্বীকার করেননি যে, তাঁর স্বামী দেহরক্ষা করেছেন। তিনি যে অজর অমর!

আনন্দের কথা এই যে স্বাধীনতার যোদ্ধারা এই বাঘা যতীনের জীবন থেকে সম্মুখ-সমরের শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে কাজে লাগান।

বাংলায় এরপর বহু যুদ্ধ হয়ে গেছে। কেই-বা তার খবর রাখে! সালখে, গৌহাটী, কলতাবাজারে খণ্ডযুদ্ধ হয় ইংরেজের সঙ্গে। মাদ্রাজের আস্কবী সীতারাও এই একই পথ গ্রহণ করেছিলেন।

চট্টগ্রামের জালালবাদী যুদ্ধ আজ আর কারও অজানা নেই। আর চিরস্মরণীয় আমাদের আজাদ হিন্দ বাহিনী।

শোনা যায়, বালেশ্বর হাসপাতালে জনৈক বাঙালী ডাক্তার বাঘা যতীনকে হাসপাতাল থেকে কৌশলে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেন। অন্য একটি মৃতদেহকে তাঁরই শয্যায় বস্ত্রের আবরণে ঢেকে রাখেন। পরে সন্ন্যাসীর বেশে কোলকাতায় কালীমায়ের



স্যার চার্লস টেগার্ট

মন্দিরে তাঁকে একবার দেখাও গেছে। যতীন্দ্রের মন্ত্রগুরু মহারাজ ভোলা গিরি বলেন: "বাচ্চা জিন্দা হ্যায়।" সদ্‌গুরুর এই বাণীতে তাঁর সহধর্মিণী আজীবন সধবা বেশেই জীবন কাটান।

বাঘা যতীনকে যখন আহত অবস্থায় স্ট্রেচারে তোলা হয় তখন

তিনি বলেছিলেন—'The entire responsibility of this clash is mine. These boys are innocent.'

স্যার চার্লস টেগার্ট ব্যারিস্টার জে. এন. রায়কে বলেন, 'I met the bravest Indian, I have very high regard for him. He is the only Bengalee who fought in open trench with so many British military soldiers.'

আমরাও পরম শ্লাঘায় স্ফীত বক্ষে প্রণতি জানাই সেই মৃত্যুত্তীর্ণ শাশ্বত বীরকে, আর বলি, "হে বীরাগ্রগণ্য, তুমি যে বিশ্ব-বিপ্লবের পুরোধা ! আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার যোগ্য হতে পারি।"



বাঘা যতীনের বিপ্লবী-জীবনের অন্তরঙ্গ সহচর

জগদ্‌গুরু সত্যানন্দ পুরী

পরিশিষ্ট

Blessings of Raja Mahendra Pratap

Peace Front

45, Rabindra Nagar
New Delhi - 110003
12th Oct., 1977

Dr. N. K. Roy Choudhury has written this nice book styled as big revolutionary "Baga Jatin".

He is a real freedom-fighter and is known to me from far east Asia for a long time.

I think, his book will help everybody to understand the great revolutionary. There was a war with the British soldiers on the 9th September, 1915 with four brave followers. It was a trench fight for about 6 hours by the Police Commissioner Sir Arthur Charles Tegart and other British officers, because all four ships sent by Gadar Party from outside India but it was leaked up at Singapore and after that no arms and ammunition could reach in India.

So there was only fight with the British soldiers at Baleswar.

M. Pratap

* * *

১৩০৭ সালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালপ্রয়াণে শোকক্লিষ্ট যতীন্দ্রনাথ ও তৎপত্নী কাশী হইয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হন। ভোলা গিরি মহারাজের আশ্রমে যতীন্দ্রনাথ দীক্ষা নেন। তারপরে তাঁহার স্ত্রী ও দিদি দীক্ষা নেন। মহারাজ ভোলা গিরির প্রেরণায় তিনি আধ্যাত্মিক পথে শনৈঃ অগ্রসর হন। মহারাজ ভোলা গিরির কাছে তাঁহার আদরের নাম ছিল "শের কা বাচ্চা",—"শূরবীর"। তাঁহার দেশমাতৃকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির যজ্ঞের প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন মহারাজ ভোলা গিরি। যখন তিনি বালেশ্বরে অজ্ঞাতবাসের পথে অগ্রসর হন তখনও গুরুজীর আদর্শ, উৎসাহ এবং আশীর্বাদ তাঁহার জীবনের মূল পাথেয়স্বরূপ ছিল।

ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলোৎকুমার রায় চৌধুরী (১৭১/৩ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯) যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই চমৎকার তথ্যভরা বইখানি লিখিয়াছেন। বাঘা যতীন ও তাঁহার সহযোগীদের বীরত্বপূর্ণ আত্মদানের কথা, গ্রন্থকার তাঁহার এই বইখানিতে সম্পূর্ণভাবে লিখিয়াছেন।

তাঁহার এই অপূর্ব প্রচেষ্টায় সর্ব শুভ কামনা রইল।

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি

ভোলানন্দ সংন্যাস আশ্রম
ভোলা গিরি রোড, হরিদ্বার
২৫. ৮. ৭৭

* * *

আমি ডাক্তার নীলোৎকুমার রায় চৌধুরীর সহিত বহুদিন ছোটবেলা হইতেই বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তিনি বরাবরই বহু বিপ্লবী কর্মে জড়িত ছিলেন এবং গোপনে গোপনে বহুপ্রকারে বহু বিপ্লবী কর্মে সততার সহিত সহায়তা করিয়াছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় যে ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার রাজনৈতিক দিকপাল ও বহু স্বদেশীযুগের বিপ্লবী নেতা, যথা—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি সরকার, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতির সহিত বরাবর যোগাযোগ ছিল এবং স্বামী সত্যানন্দ জগদ্গুরু পরিব্রাজক পরমহংস, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, থাইল্যাণ্ড ও ভারতের বাইরেও বরাবর যোগাযোগ ছিল এবং বিশেষ করিয়া নেতাজী সুভাষবাবুর সহিতও খুব বেশী যোগাযোগ ছিল ও সকলেই ওঁকে খুবই স্নেহ করিতেন ও বিশ্বাস করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং দেশবন্ধু, বাসন্তী দেবী, শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি ওঁকে খুবই ভালবাসিতেন। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ওঁকে খুবই স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং ইনি ১৯৩০ সালের প্রথমে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েতে ডাক্তার ছিলেন ও চাকরী করিতে করিতে বিশেষ কোন কারণে ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুর চলিয়া যান। যাওয়ায় পূর্বে উনি বিখ্যাত মহাবিপ্লবীর পুত্র শ্রীতেজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমাকে আলাপ করিয়ে দেন। জাপানে স্বাধীনতা সংঘ 'Indian Independence League'-এর প্রতিষ্ঠাতা 'রাসবিহারী বসুর ও বাঘা যতীনের অন্যতম দক্ষিণহস্ত স্বামী সত্যানন্দ জগদ্গুরু পরিব্রাজক পরমহংসদেব এবং তাঁহার প্রিয়শিষ্য যখন Singapur-এ আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের Conference ও টোকিও-যাত্রার পথে বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন সেই স্বামী সত্যানন্দ পুরীর সাথে ও আজাদ হিন্দ সরকারের পরবর্তী

কালে উপদেষ্টা হিসাব নিযুক্ত বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ জন থিবির সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

ডাঃ রায় চৌধুরী বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওরফে বাঘা যতীনের আত্মীয়বর্গের সহিত বিশেষভাবে বহু বৎসর ধরিয়া বহু ব্যাপারে পরিচিত ও ছেলেমেয়েদের ও পরিবারবর্গকে বহুরকম ভাবে বিপদে আপদে সহায়তা করিয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথের পরিবারের জন্য আমি বালিগঞ্জ প্লেসে একখণ্ড জমি তাঁহার স্ত্রীর নামে বাড়ী তৈরী করিবার জন্য ক্রয় করিয়া দিই, তাহার জন্য আমাকে বৃটিশ সরকারের কোপানলে পড়িতে হয়। আমি মানবিক কারণ দর্শাইয়া তৎকালীন পুলিশের বড়কর্তা স্যার চার্লস টেগার্টের কাছে কৈফিয়ত দিয়া কোনরকমে রেহাই পাই। পরে আমি ও ডাঃ রায় চৌধুরী বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ী-তৈরীর ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যাপারে বহুপ্রকারে সহায়তা করিয়াছি।

১৪, শ্রীনাথ দাস লেন
কলিকাতা-১২

ইন্দ্রভূষণ বিদ
২০.২.৭৭

—